International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

লোকঐতিহ্য ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

পল্লবী সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ঊনিশ শতকের প্রথম থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যখন বাঙালির মননচর্চার সুযোগ ঘটে, সেই সময় বাংলা সাহিত্য পুরোনো সব সীমা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। নানা কারণে তখন তাকে হাত পাততে হয়েছিল ইউরোপের কাছে। তবুও কবি মধুসূদন ফিরে এলেন কৃত্তিবাসী রামকথায়, রচিত হল কালজয়ী সাহিত্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'। উনিশ শতকের যুক্তিবাদ, সমাজসংস্কার, ধর্মভাবনা যতই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুঁজে বেড়াক, বাঙালি জীবন রামকথার কৃত্তিবাসী রূপান্তরেই ছিল স্বচ্ছন্দ। এই পরিচিত আবহকেই ভাঙতে চেয়েছিলেন মধুসূদন, সেটাই ছিল তাঁর আধুনিকতার ঘোষণা। আর সেই কারণেই রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' ত্রয়ী মহাকাব্যের বৃহদায়তন কৃষ্ণকাহিনী নয়, বাঙালি পাঠক এক অর্থে আধুনিকতার সূচনা বলে মেনে নিয়েছে 'মেঘনাদবধ' কাব্যকেই। তবু মধুসূদনের এই কাব্যকে কি লোকঐতিহ্যের প্রবহমান তার উদাহরণ বলা যায়? মধুসূদন থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা কবিতায় বারবার এসেছে লোকসাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন কাহিনি, রূপকথা অনেক সময় ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক কবিতায়—রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' রূপকথা বলে চিহ্নিত হলেও তার উৎস দেশজ নয়, কিন্তু 'সোনার তরী' কাব্যের 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা ও সুপ্তোত্থিতা' কবিতায় ফিরে এসেছে রূপকথার জগত। তাঁর পরবর্তী কবিদের কবিতাতেও ব্যবহৃত হয়েছে রূপকথার নানা চরিত্র, মঙ্গলকাব্যের বেহুলা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনির উল্লেখ।

কবিতার জগতে আধুনিকতার বাঁক ফেরা শুরু হয় তিরিশের দশকে। এই সময়ের কবিতায় ছিল প্রবল আত্মসচেতনতার উচ্চারণ, ছিল নাগরিক মননের সংকট। এই নাগরিক মনন প্রত্যাখ্যান করেছিল লোকজীবন ব গ্রামীণ জীবনকে। ফলে এই সময়ের কবিতায় লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া লাগার সুযোগ ছিল না। কিন্তু অন্তরের টানকে না মানলে কোনো আধুনিকতাকেই ধরা যায় না, এই সত্য যখন বোঝা যায় তখনই তা হয়ে উঠতে পারে মহৎ সাহিত্য। বিভূতিভূষণের 'পথের

পাঁচালী' যখন বাংলা সাহিত্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে, তখন বুদ্ধদেব বসু এই সহজ-সরল গ্রাম্য জীবনের কাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে পারেন নি। নাগরিক বোধে তাঁর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। কিন্তু তিনি কি লোকঐতিহ্যের প্রভাবকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন? তাঁর কবিতায় কঙ্কাবতীর পুনরাবৃত্ত উচ্চারণ আমাদের মনে করিয়ে দেয় রূপকথার নায়িকার অনুষঙ্গ, যে রূপকথা লোকঐতিহ্যের সঙ্গেই জড়িত। তবে রূপকথার এই সংযোগ হয়তো পরোক্ষ, বা কবি বুদ্ধদেব বসু হয়তো সচেতনভাবে করেন নি, তবুও লোকঐতিহ্যের ফল্গুধারা যে ভিতরে ভিতরে বয়ে চলে তা টের পাওয়া যায়। অন্যদিকে দেখি নাগরিকতার অভিজ্ঞান কবিতায় থাকলেও তিরিশের কোনো কোনো কবি লোকঐতিহ্যকে তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করেছেন কিছুটা সচেতন ভাবেই, ঠিক যেন সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে পথ খোঁজার চেষ্টা।

পথ সন্ধানের ব্যাকুলতা থাকলেও লোকঐতিহ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক স্তরে। লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল গ্রামীণ লোকজীবনের বাস্তবতা ও কিছুটা কল্পনার মিশ্রণে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবতার যেমন বদল ঘটেছে তেমনই বদলে গেছে কল্পনার জগৎ। জন্ম নিয়েছে নতুন মিথ। আধুনিক বাংলা কবিতার একটা অংশে দেখা যাচ্ছে, লোকঐতিহ্যের বিষয়, কাহিনী, লোকসংস্কৃতির নানা ধরনকে নতুন ভাবে প্রয়োগ। এই পুনর্নির্মাণ সম্ভব প্রতিবাদের ধারণাতেই। কেননা পুরোনো কাহিনীকে যদি নতুন ভাবে ব্যাখা করতে হয় তাহলে প্রচলিত ধারণার বিপরীত যেতেই হয়। আর সমাজের পুরানো দিকগুলিকে ভাঙতে ভাঙতে নতুন গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই আধুনিকতা, সেই দিকগুলিই আধুনিক কবিরা কবিতায় খুঁজতে চেয়েছেন। তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রতিবাদের প্রতিমা। প্রতিবাদ মানেই তো উচ্চকণ্ঠ চিৎকার বা মুষ্টিবদ্ধ হাত নয়, আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে দুঃখ-যন্ত্রণার আর্তিও মিশে যায়। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমরা একইরকম বিষয় দেখতে পাই। তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে বেহুলার কথা, ফিরে এসেছে রূপকথার লালকমল, নীলকমল। প্রেমের ব্যথা-আনন্দ, নারী হৃদয়ের অনেক না বলা কথা তিনি রূপায়িত করেছেন লোকসাহিত্যের ভিতর থেকে তুলে আনা বিভিন্ন উপাদানে, ফলে কবিতার কাহিনি নতুন ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছে। আর এই কাহিনিকে নিয়ে এগোতে এগোতে একসময় কবি কাহিনিকে ছুড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছেন সমকালীন ঘটনাকে। ঘটেছে ভাবের উল্লম্ফন।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মৃত্যুত্তীর্ণ' কাব্যের 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ' কবিতায়

সর্প দংশনে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের এই চিত্র ফুটিয়ে তুলতে কবি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

''নখী রক্তচারীর ভিড়ে কি
ভয় লজ্জাও নেই মনে।''

দেবতাদের তথা সমাজের একশ্রেণির মানুষের লালসা মেটাতে গিয়ে সাধারণ নারী বেহুলা রূপান্তরিত হয়েছে বারাঙ্গনায়—

''এ কি যৌন জ্বরের জলসায়
তুই তনু দিলি অঞ্জলি—
হাসি কান্নার চুনি পান্নায়
ছুঁড়ে দিলি ছেঁড়া কঞ্চুলী।''

সমগ্র কবিতাটি আসলে এক নারীর বেদনাগাথা। কিন্তু এই বেদনার সঙ্গে মিশে আছে লাঞ্ছিত, অপমানিত নারীর বহ্নিদীপ্ত প্রতিবাদ—

''এই বেহুলা নাচানো স্বর্গ?
সে যে আগুনের মতো জ্বলে।''

সমকালীন সময়ে এই প্রতিবাদের আলোয় নারীসত্তার অপমান থেকে উত্তরণের একটা ইঙ্গিত আমরা পাই। এই দৃঢ়তার পরিচয় ছেঁড়া কাঁচুলী ছুঁড়ে দেবার মধ্য দিয়ে। সমগ্র পৃথিবী তখন হয়ে ওঠে বেহুলা নাচানো স্বর্গের প্রতিরূপ।

তাঁরই লেখা 'লখিন্দর' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতাতে মনসামঙ্গলের একই কাহিনি ভিন্ন ভাবে দেখতে পাই। লখিন্দরের মতোই এ যুগের সমাজ ও মানুষ সর্পদংশনে মৃত, তাকে বাঁচাতে চাইছেন কবি জীবনের মন্ত্রে। বেহুলা যে সমাজের কাছে দেহের কাঁচুলি ছিঁড়ে নাচছে সেই সমাজ যৌন জ্বরে তপ্ত, বিকৃত মানসিকতার মানুষ। তাই বেহুলা যখন এদের সামনে নাচে তখন স্বভাবতই বেহুলার রক্ত আগুনের মতো জ্বলে, আর এখান থেকেই সূচনা হয় বিপ্লবের। এই বিপ্লব থেকেই মৃত লখিন্দরের মতো জীর্ণ সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটে। লখিন্দরের মধ্যে এই মৃত সমাজ ও মানুষকে কবি দেখেছেন আর দেখেছেন সমাজে বিকৃতরুচির মানুষ, লুব্ধ শিকারীর দলকে। তবুও এরই মধ্যে প্রাণের মন্ত্রে লখিন্দরকে জীবিত করতে চাইছেন তিনি। বেহুলা বিপুলা, পৃথিবীর মতোই অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর।[১]

''সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত পুঁজে মাখামাখি রাত্রি

ভেলায় ভাসিয়ে। আমি কান্নার যন্ত্রণা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই। যাত্রী
যারা ভিড় করে, হায়না, শকুন, শেয়াল
কেউ বন্ধু নয়। লুব্ধ শিকারীর থাবা
ধারালো দাঁতের কশা দ্বিপ্রহরকেও
ছিঁড়ে ফেলে। তবু আমি বাংলার বিধবা
সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী!
পাতালে নরকে কিংবা যমের দুয়ারে
যেখানে ভিড়বে ভেলা, যাবো। সমুদ্রেও
শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথবো পয়ারে;
গান দেব, জ্বলব, কিন্তু হব না অঙ্গার;
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার।"

কবিতায় কবি লোকায়ত কথাবৃত্ত অর্থাৎ মনসামঙ্গলের বেহুলাকে মিলিয়ে দিয়েছেন মহাভারতের সাবিত্রীর সঙ্গে। সাবিত্রী ও বেহুলা এই কবিতায় একাকার হয়ে গেছে সতীত্বের নিরিখে নয়, তাদের চরিত্রের দৃঢ়তায়।

স্বদেশ ভাবনা থেকেও কবি অনেক কবিতা লিখেছেন। এই কাব্যের 'আমার মাকে' কবিতাটি তার মধ্যে অন্যতম। বিপ্লবী দলের মতোই দেশজননীর সঙ্গে মাতৃ মূর্তির একরূপতা তাঁর কবিতায় দেখতে পাই—

''আজন্ম তোমাকে আমি ডেকেছি মা বলে
ঘুমে কিংবা জাগরণে
... ...
রক্তস্নাত তবু মাগো জন্মে জন্মে ফিরে আসি তোমারই কুটিরে।"

ষাটের দশকে নিরন্ন, রিক্ত জননী এবং প্রিয়তমের প্রতীক্ষারত বেহুলার প্রতীকে দেশের সমসময়ের চিত্রকে তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সভা ভেঙে গেলে' কাব্যের 'তোর বুকের মধ্যখানে' কবিতায় কবি লিখেছেন—

''..... সারা অঙ্গ মন্ত্র হচ্ছে, তোর বুকের মধ্যখানে আমি
দেখতে পাচ্ছি নবজন্ম, শুনতে পাচ্ছি শিবের নিঃশ্বাস।
কোথাও সধ্বা নাচছে, নেচে উঠছে মৃত লখিন্দর;
চন্দন নিমের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস।"

হাংরি আন্দোলনের সমকালীন সময়ের প্রভাব পড়েছে বলা যায়। আসলে মানুষের আশা অবিনাশী। আন্দোলনের মধ্যে দাঁড়িয়েও সে স্বপ্ন দেখে। তাই বেহুলার নৃত্য-গীতের মাধ্যমে মৃত লখিন্দরের পুনরুজ্জীবন আশাবাদের স্বর শোনায়।

'মুখে যদি রক্ত ওঠে' কাব্যের 'বেহুলা' কবিতাটি একালের প্রেমচেতনার আলোকে লেখা। কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লখিন্দর নিয়তির স্বীকার। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের ফলে বাসরঘরে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। এখানে লখিন্দরের কোনো অপরাধ ছিল না। তবুও সমস্ত পরিস্থিতির শিকার লখিন্দর। চাঁদসদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বের ফলে বেহুলা-লখিন্দরের নববিবাহিত জীবন শুরুতেই গাঙুড়ের জলে ভেসে যায়। বেহুলাকে অকাল বৈধব্য গ্রহণ করতে হয়। সমকালীন অভিশপ্ত সমাজে যন্ত্রণাময় জীবনকে কবি লখিন্দরের অপরাধহীন মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। জলে ভাসে 'অবাক লখিন্দর'—

জলে ভাসছে অবাক লখিন্দর;
কন্যা! তুমি কোথায় গিয়াছিলে?

এত কিছুর পরেও কবি বেহুলাকে নিয়ে আশার স্বপ্ন দেখেন। এখানেই কবি বেহুলা ও লখিন্দরকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। আর এভাবেই আমরা দেখতে পাই লোকঐতিহ্যের প্রবহমানতা।

'মহাদেবের দুয়ার' কাব্যের ২৩ সংখ্যক কবিতাতেও মনসামঙ্গলের বেহুলার প্রসঙ্গ পাই—

''অন্ধকারে দেখা যায় না
অনুভব করা যায়
চোখের জলের নদী প্রবাহিত
এইখানে।
পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কেঁপে ওঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে,
অসহায়।"

সর্পাঘাতে মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলার আত্মোৎসর্গ,

কলার ভেলায় লখিন্দরের মৃতদেহ নিয়ে সমস্ত বাধা, প্রলোভনকে অতিক্রম করে স্বামীকে পুনর্জীবিত করা, এর মাধ্যমে রূপকায়িত হয়ে উঠেছে অচেতন স্বদেশ এবং স্বদেশের প্রাণসত্তায় নিহিত সংকল্প শক্তি। তাই কবিতায় কবি বলেছেন—বেহুলার ভেলা শূন্য থাকলেও অসহায়তা, দুর্ভিক্ষেও সে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলে।

'আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা' কাব্যের 'বেহুলার ভেলা' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা। তিন লাইনের এই কবিতায় গাঙুড়ে ভাসমান বেহুলার ভেলার সঙ্গে স্বদেশের কাগজের নৌকা নিয়ে খেলার প্রসঙ্গ আছে—

''গাঙুড়ের জলে ভাসে বেহুলার ভেলা
দেখি তাই, শূন্য বুকে সারারাত জেগে থাকি—
আমার স্বদেশ করে কাগজের নৌকা নিয়ে খেলা।"

কবি স্বল্প কথায় বোঝাতে চেয়েছেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি সফলতা অর্জন করবেই, স্বৈরাচারী শাসকের অধীনস্থ দেশ তা পারে না। বেহুলার ভেলা সমগ্র স্বদেশের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রতিফলিত হয়েছে সমকাল।

এছাড়াও কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আরেকটি কাব্য 'শীত বসন্তের গল্প', যেখানে মানুষের অগ্রগতির বিজয়রথকে তিনি চিহ্নিত করেছেন অরুণ বরুণ কিরণমালার প্রতীকে—

''ঘর ছেড়েছে অরুণ
.....পাথর
পথ হেঁটেছে বরুণ
.....পাথর;
দেখতে দেখতে আকাশ পাথর, মেঘ পাথর,
পাথর গাছপালা।
পাথর দেশে পাহাড় ভেঙে, আকাশ ভেঙে
চলেছে কিরণমালা...।"

'নীলকমল লালকমল' কবিতায় এক সত্যিকারের সুন্দর, সুস্থ স্বদেশের অনুসন্ধান মূর্ত হয়ে উঠেছে রূপকথার উল্লেখে—

''নীলকমল আর নালকমল
খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা
লুকিয়ে যিনি মানুষ খাবেন না
সত্যিকারের মা।

এই দেশে নয় ওই দেশেও নয়
কোথায় আছে সত্যিকারের দেশ
সত্যিকারের আকাশ, সত্যিকারের বাতাস
খুঁজছে তারা খুঁজছে তারা
কোথায় আছে ভোরবেলার
অমল আলোর মতো
সত্যিকারের মা।"

শুধু তাই নয়, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকেও তিনি রূপকথার আবহে তুলে ধরেছেন—

".....আমার দুয়োরানী মায়ের কান্না-শুধুই কান্না
স্বপ্নকেও ঘুম পাড়ায়! মাঝেমধ্যেই স্বপ্ন তাই
পাথর হয়ে আমাকে ভয় দেখায়....."

আধুনিক সময়ের দ্বান্দ্বিকতায় লোকঐতিহ্য ভেঙেছে এবং ভাঙছে। আর এই লোকঐতিহ্যই ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক কবিতায়। কবিতায় বলা হয় অনুভবের কথা। "প্রাচীন কাব্য গেয়ে গেয়ে জীবিকা অর্জন করতেন কথক, তাদের কথকতা থেকে প্রাচীন কাব্যের অসংখ্য গল্পও লোকসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। যেসব কাহিনি তাদের মনকে আন্দোলিত করত, সেগুলো তারা মনে গেঁথে রাখত, আবার নিজেরাই উত্তরপুরুষকে শোনাত। আবার অনেক সময়ে প্রাচীন কাব্যের কাহিনির মূল উৎস হল লোকসমাজে প্রচলিত কোনো সহজ সরল গাথা। এই লৌকিক উৎসটিকে লেখক মনের মাধুরী মিশিয়ে আরও অপরূপ করে তুলেছেন। প্রাচীনকালে লিখিত কাব্য কথকের মাধ্যমে যেমন প্রচারিত হয়েছে, তেমনি লৌকিক উপাদান লেখকের প্রয়োজনে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ...লৌকিক এইসব গাথা-রূপকথা-বীরকথা-পশুকথা ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো পুরাণকথার মর্যাদা পেয়েছে, আবার এই পুরাণ কথার আদিম কাঠামো থেকে গড়ে উঠেছে উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের বহু কাব্য-পুরাণ-মহাকাব্য।"[২] এভাবেই সমকালের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অনুভবকে তুলে ধরতে লৌকিক প্রসঙ্গ পেয়েছে নতুন ভাষ্য, নতুন ব্যাখ্যা। এই কাজটি সম্ভব যখন লোকঐতিহ্য প্রতীকরূপে কবিতায় ব্যবহৃত হয়। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতায় এভাবেই লোকজ উপাদানকে তুলে ধরেছেন। আর লোকজ উপাদান সৃষ্টি হয় ঐতিহ্যের মাধ্যমেই। তাঁর কবিতায়

লালকমল-নীলকমল, বেহুলা তো প্রতিবাদেরই প্রতীক—যেমন কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যেই কবি মধুসূদন খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর আধুনিকতার বোধকে, প্রতিবাদের ভাবনাতেই। এভাবেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় লোকঐতিহ্যের আড়ালে সমকালীন সমাজ, স্বদেশ, রাজনৈতিক-আর্থসামাজিক জটিলতার গভীর সত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সূত্রনির্দেশ :

বার্ণিক রায়, কবিতায় মিথ্, পুস্তক বিপণি, কলকাতা জুলাই ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৩১।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার, লোককথার ঐতিহ্য, গাঙচিল, কলকাতা আগষ্ট ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৯।

উল্লেখপঞ্জি :

চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র। ১৯৭০। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা : ভারবি

চক্রবর্তী, সুমিতা। ১৯৯৯। *আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়*, কলকাতা : প্রজ্ঞাবিকাশ।

মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার। ২০১৯। *আধুনিক বাংলা কবিতায় পুরাপ্রতিমা*, কলকাতা : প্রতিভাস।

সহায়ক পত্রিকা—

অনিল আচার্য (সম্পাদক), *অনুষ্টুপ*, শীত ১৯৯৬।